ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1644-1651
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.385

বিশ শতকে প্রচলিত অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে শিক্ষিত মহিলাদের কণ্ঠস্বর: 'ভারত-মহিলা' পত্রিকায়

অনন্যা সামন্ত, *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The magazine 'Bharat-Mahila' was published in the month of Bhadra in the year 1312 of the Bengali calendar. It was an illustrated monthly magazine, edited by Sarajubala Dutta.
In the early twentieth century, although women's education had begun to spread among girls, many women were still confined within the inner quarters of their homes. They could neither live according to their own wishes nor step outside the house. They often compared their condition to that of a bird trapped in a cage.
At that time, a sense of awareness about their situation began to grow among some educated women. They started to realize that they had the right to live life on their own terms. This realization awakened in them a desire for freedom. Through their writings, they repeatedly expressed the many hardships and sufferings they endured while living within the inner quarters.
In this essay, I have discussed how educated women protested against this state of confinement within the inner quarters, known as the purdah system.

Keywords: 'Bharat-Mahila', Sachitra Masik Patrika, Sarajubala Dutta, Twentieth century, Women's Freedom, Seclusion of Women

বৈদিক যুগে মেয়েদের জন্য লেখাপড়ার রীতি প্রচলিত থাকলেও সময়ের সঙ্গে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছিল। উনিশ শতকেরমেয়েরা পড়াশোনা করার কথাভাবতেও ভয় করত। কারণ তখনকার দিনে এই ধারণা প্রচলিত ছিল— স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রসম্মত নয়, কেউ বলত লোকাচার বিরুদ্ধ, কেউ বা বলত লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হবে, আবার কারোর মতামত ছিল লেখাপড়া শেখার মতো বুদ্ধি মেয়েদের নেই।[১] সেকালে এই প্রচলিত মতের বিরোধিতা করেগৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' (১৮২২) বইয়েতে 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন'–এর মাধ্যমে সেকালে অন্তঃপুরের মেয়েরা লেখাপড়া নিয়ে কি মনে করত সেই দিকটি দেখিয়েছিলেন—

> "প্র। ভাল, লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম্ম করিতে হয় না? স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন? তাহা কি পুরুষে করিবে।

> উ। না, পুরুষে করিবে কেন? স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাজ কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।
>
> প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝলাম যে লেখা পড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখা পড়া যদি স্ত্রীলোকে করে, তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।"[২]

উনিশ শতকেতারশঙ্কর তর্করত্ন, হরচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ রায় ছাড়াও অনেক মহিলার লেখাতেও স্ত্রীশিক্ষার কথা ফুটে উঠেছিল। যেহেতুমেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের অভাব ছিল, তাই এই বিষয়ে অনেক অন্তঃপুরে বন্দি মহিলাদের মধ্যে লেখাপড়া নিয়ে ভীতি থাকলেও, কিছু মহিলার মধ্যে পড়াশোনার প্রতি উৎসাহও জেগেছিল। প্রথম বাঙালি মহিলা আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দাসী তাঁর সময়ের মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছিলেন—

> "তখন মেয়েছেলেরা লেখাপড়া শিখিত না, সংসারে খাওয়া দাওয়ার কর্ম্ম সারিয়া কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিত, তখন কর্ত্তা ব্যক্তি যিনি থাকিতেন, তাঁহার নিকট অতিশয় নম্রভাবে দন্ডায়মান থাকিতে হইত। যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম্ম বৈ আর কোন কর্ম্মই নাই। তখনকার লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল। বিশেষতঃ তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড় ভাল বৌ হইল।"[৩]

অর্থাৎ ভালো বউ মানে ছিল যে সারাদিন সংসারের কাজ করে যাবে, মাথাতে একহাত ঘোমটা দেবে এবং কোন কথা বলবে না।এছাড়াও উনিশ শতকের আরও এক লেখিকা কৈলাসবাসিনী দেবী 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থ' (১৮৬৩) গ্রন্থে মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে পুরুষদের নানারকম দৃষ্টিকোণের কথা লিখেছিলেন। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাদিগের স্বাধীনতা'তে তিনি বলেছিলেন—

> "হায়! কি ভ্রান্তিমূলক বাক্য, আমাদিগের বঙ্গদেশীয় মহাত্মাগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বলেন; "অবলাগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইলে, তাহারা আর অন্তঃপুররূপ পিঞ্জর বদ্ধ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে না, এবং অন্যান্য দেশীয় যোষাগনের ন্যায় স্বেচ্ছা-মত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে ইচ্ছুক হইবে, ও ইউরোপীয় বর-বর্ণিগণের তুল্য ভাব ধারণ করিয়া সকল পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করণে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপে তাহারা সর্ব্বত্র গতায়াত ও সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনাপন অবস্থার প্রতি বিরক্ত হইবে, এবং অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবে। অতএব নারীগণকে বিদ্যা শিক্ষা করান কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।" আহা! হিন্দুধর্ম্মাভিমানী মহদাশয়গণ কি যুক্তিই করিয়া থাকেন; বিদ্যার কি আকর্ষণী শক্তি আছে যে তদ্দ্বারা নারীগণকে বাহির করিবে; আর নারীগণ যে স্বাধীনতা ইচ্ছা করিবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? একাল পর্য্যন্ত ত কোন দেশীয় কামিনীগণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই, তবে বঙ্গদেশীয় মহিলাগণ কি প্রকারে স্বাধীনতা ইচ্ছা করিবে।"[৪]

এছাড়া তাঁর আরও একটি গ্রন্থ 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' (১৮৬৫)তে মেয়েদের নিয়ে পুরুষদের মানসিকতা কেমন ছিল সেই সম্পর্কে বলেছিলেন—

> "তাঁহারা কহিতেন যে অবলাগণকে ঈশ্বর স্বভাবতই নির্ব্বোধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আর উহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজনই বা কি আছে কারণ উহাদিগের ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবেক না, উহারা গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে, গৃহকর্ম্মে বিদ্যার কি আবশ্যক, তবে যদি এরূপ হয় যে তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া রাণী ভবানী প্রভৃতির ন্যায় স্ব স্ব বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হয় তবে উহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন বটে, নচেৎ উহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের কোন আবশ্যক নাই, আর আমরা মধ্যবিধ গৃহস্থ, আমাদিগের বনিতাগণের বিদ্যাভ্যাসে কোন প্রয়োজন নাই।"[৫]

পরবর্তীকালে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন হওয়ার পরে মেয়েদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও, অনেক মহিলাই ছিলেন অশিক্ষিত ও অন্তঃপুরে বন্দি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অন্তঃপুরের মহিলারা শিক্ষিত হওয়ার ফলে, তাঁদের মধ্যে মানসিকতার পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল। তাঁরা নিজেদের অন্তঃপুরের একঘেয়ে গৃহবন্দি জীবনথেকে মুক্ত হতে চাইছিলেন।নিজেদের অবস্থাকে খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতো বলে মনে হচ্ছিল তাঁদের। ১৩০৪ সালে কৃষ্ণভাবিনী দাস মেয়েদের এই অবস্থার বিরোধিতা করে লিখেছিলেন—

> "আমি এখন স্পষ্ট দেখিতেছি ও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতেছি–হিন্দু নারীদের এই নীচগামী অবস্থার প্রথম ও প্রধান কারণ–সম্পূর্ণরূপে অবরোধ-প্রথা ও পবনির্ভরতা। ইংরেজ মহিলাদের বাদ দিলেও এই ভারতবর্ষের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই, যে, যে জাতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা চলিত আছে, তাহাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থাই অধিকতর উন্নত। আর সেই স্বাধীন নারীদের জীবন অধিকতর কর্ম্মক্ষম, সাহসী ও আত্মনির্ভর। অনেকেই জানেন, পার্সীদের মধ্যে অবরোধপ্রথা হিন্দুদের ন্যায় অত দৃঢ় নহে, সে জন্য পার্সী নারীরাও তাঁদের হিন্দু ভগিনীদের অপেক্ষা অধিক সাহসী, বলিষ্ঠ ও আত্মনির্ভর।"[৬]

অর্থাৎ পার্সীরা ছাড়া প্রায় মহিলারা অবরোধ প্রথারদ্বারা ভুক্তভোগী ছিলেন। তাঁরা না বাইরে যেতে পারতেন, না নিজের ইচ্ছে মত বাঁচতে পারতেন। বেগম রোকেয়া 'অবরোধ-বাসিনী' গ্রন্থের প্রথমেই বলেছিলেন—

> "আমরা বহু কাল হইতে অবরোধে থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের— বিশেষতঃ আমার কিছুই নাই। মেছোণীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "পচা মাছের দুর্গন্ধ ভাল না মন্দ?" —সে কি উত্তর দিবে?"[৭]

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি— মানুষ দীর্ঘদিন যে অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকে, সেই অবস্থাকে তাঁর ভাগ্য বলে ধীরে ধীরে স্বীকার করে নেয়। তাঁর প্রতিবাদ ক্ষমতা হারিয়ে যায়। কিন্তু সময় কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে না। তাই সেই সময় কিছু মহিলা শিক্ষিত হওয়ার পরেগতিহীন, একঘেয়ে, দুঃখ-কষ্টের জীবন থেকে বার হয়ে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি করেছিলেন। তাঁরা নিয়তির হাতে সব কিছু ছেড়ে না দিয়ে, লড়াই করে নিজেদের ভাগ্যকে নতুন করে লিখতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন,পথ যেখানে তৈরি না থাকে সেখানেনিজের পথ নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়।

উনিশ শতকের মহিলারা শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে নিজেদের অবস্থা নিয়ে সচেতনহয়ে উঠলেও, সমস্ত মেয়েদের মধ্যে এই সচেতনতা তখনও জন্মায়নি। কারণ—

> "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও, বিংশ শতাব্দীর নারীমুক্তি আন্দোলনকারী আদর্শের সঙ্গে এই মহিলাদের আদর্শের তেমন সাদৃশ্য ছিলো না। তাঁরা তখনো পুরুষ সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। শিক্ষা লাভ করে তাঁরা সেই ধরনের মহিলা

> হতে চাচ্ছিলেন শিক্ষিত ভদ্রলোকরা যাঁদের আদর্শ বলে গণ্য করছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন, পুরুষপ্রধান সমাজে শিক্ষা লাভ করে 'আধুনিক' স্ত্রী এবং মাতা হওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোন বিকল্প নেই।"[৮]

যদিও সব শিক্ষিত মহিলাদের এক ইচ্ছা ছিল না। কোন মহিলা যেমন সমাজের চোখে আদর্শ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, তেমনই কিছু মহিলার ইচ্ছা ছিল নিজের মত করে বাঁচার। ১৩০২ সালে নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী অবরোধ প্রথার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,

> "আমরা পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় নিয়ত অবরোধরূপে পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছি, কাজেই আমাদের মনোবৃত্তি সকল ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রস্ফুটিত হইতে পারিতেছে না। সৎজ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে জীবন উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। সৎজ্ঞান ব্যতীত দুর্লভ মানব জীবন পশুর অপেক্ষাও হেয় ভাবে যাপন করিতে হয়। আমরা বাল্যকাল হইতে পিঞ্জরাবদ্ধ আমরা সৎজ্ঞান কোথায় পাইব?"[৯]

তাঁর এই উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি, সেই সময় কোন কোন মহিলা গৃহবন্দি জীবনকে পাখির মতো খাঁচাতে বন্দি বা পশুর থেকেও হীন অবস্থা বলে ভাবত।

উপরিউক্তগ্রন্থগুলি ছাড়াও অবরোধ প্রথা নিয়ে সেকালে বহু লেখালেখি প্রকাশিত হয়েছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'ভারত-মহিলা' পত্রিকাতে। বিশ শতকের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে সরযূবালা দত্তের সম্পাদনায় 'ভারত-মহিলা' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘ তেরো বছর ধরে চললেও ১৩২৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যাটি প্রকাশের পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।অবরোধ প্রথা বৈদিক ও রামায়ণ-মহাভারতের যুগে প্রচলিত ছিল না। সেই সময় মেয়েরা বাড়ির বাইরে যেতে পারতেন এবং বিদ্যাচর্চাও করতেন। এই পত্রিকাতে কমলা সথিয়ানাধনের লেখা একটি ইংরাজি প্রবন্ধের অনুবাদ 'প্রাচীন ও নব্য ভারতে নারীজাতির অবস্থা' নামে ১৩১২ সালের কার্তিক মাস থেকে কয়েকটি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—

> "বৈদিক সময়ে আর্য্যনারীর অবস্থা অতি সম্মানিত, অতি গৌরবময় ছিল। সে সময়ে তাঁহাদের কার্য্যে কেহ কোন অন্যায় প্রতিবন্ধক স্থাপন করিত না। তাঁহারা সমাজে উন্মুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। নারীদিগকে অশিক্ষিতা রাখিবার জন্য তখন কোন চেষ্টা করা হইত না, এবং সকল বিষয়েই তাঁহারা স্বামীর সমাবস্থাপন্না ছিলেন, তাঁহাদিগকে কাহারও,—এমন কি শাশুড়ীরও অধীনতা স্বীকার করিতে হইত না। হিন্দুনারী জ্ঞানালোচনায় তখন স্বামীর সহযোগিনী ছিলেন। স্বামীর নিকট তিনি প্রচুর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইতেন এবং পত্নী ও মাতারূপে গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন।"[১০]

প্রাবন্ধিক এই বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য বেদের ব্রাহ্মাণাংশে উল্লেখিত যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদের উদাহরণ দিয়েছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ যাওয়ার সময় তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ী ওসপত্নীকে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী দেবী বিষয় গ্রহণ করতে অসম্মত হয়েছিলেন। তার বিনিময়ে 'অমৃতত্ব-তত্ত্ব' লাভ করার পথ জানতে চেয়েছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে সেই শিক্ষাও দিয়েছিলেন। একবারের জন্যেও তাঁর স্ত্রীকে বারণ করেননি। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, সেকালে শিক্ষিত মহিলাদের কাছে বিষয়-সম্পত্তির থেকে জ্ঞান-চর্চা বেশি মূল্য পেয়েছিল। এমনকি তাঁদের ধর্মতত্ত্ব ও সাধারণ প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া মুনি-ঋষিদের চোখে অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হত না।

এরপর হেমলতা সরকারের লেখা 'নারীজাতির শিক্ষা' ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাস থেকে কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখাটি তিনি মহিলা সমিতিতে পড়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন যে আমাদের দেশে আগে ছিল, তার প্রমাণ— গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী প্রভৃতি মহিলাদের নাম আমরা সকলেই শুনেছি।সেকালের সমাজে মেয়েদের অবস্থান কেমন ছিল সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— হিউয়েন সাং যখন ভারতবর্ষে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন, তখন প্রকাশ্য রাজসভায় সম্রাট হর্ষবর্ধনের দক্ষিণে তাঁর বিধবা ভগ্নী রাজ্যেশ্বরী বসেছিলেন। তিনি সেখানে বসে জ্ঞান ধর্মের আলোচনা শুনেছিলেন। এর থেকে আমরা জানতে পারি, তখনকার দিনে মেয়েদের জন্য অন্তঃপুরের বাইরে থাকার অধিকার ছিল। প্রাবন্ধিকের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথম, জ্ঞান লাভ। দুই, অর্থ উপার্জন। তাঁর মতে, দেহের এবং মনের বিকাশ হল প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে শিক্ষা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তা প্রকৃত শিক্ষা নয়। এদেশের নারীরা শারীরিক দিক থেকেও সুস্থ এবং সবল নয়। এই স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান অন্তরায় হিসাবে তিনি অবরোধ প্রথাকে দায়ী করেছিলেন। কারণ এই প্রথার জন্য মহিলারা মুক্ত বায়ু নিতে এবং পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করতে পারতেন না। অন্তঃপুরবাসীদের জন্য এই স্বাভাবিক ব্যাপার অনুভব করারও অধিকার ছিল না। সমাজ পুরুষের হাতে নারীর সমগ্র জীবনের ভার দিতে সক্ষম কিন্তু তার নিজের হাতে নিজের ভার অর্পণ করতে প্রস্তুত ছিল না। নারীদের মনে করা হত—

> "বাল্যে পিতৃবশে তিষ্ঠেৎ পতিগ্রাহস্য যৌবনে,
> রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রাঃ ন স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি।
> নারী বাল্যকালে পিতার বশে থাকিবেন, যৌবন পতির বশে থাকিবেন, বার্দ্ধক্যে পুত্রগণ তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, নারী স্বাধীন থাকিতে পারেন না।"[১১]

ভারতবর্ষে মেয়েদের নিয়ে এমন মতাদর্শপ্রচলিত থাকলেও, একই সময়ে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় মহিলারা জ্ঞানার্জনে, আশ্চর্য কাজের দক্ষতায়, প্রবল পরোপকার বৃত্তিতে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ফলে সমগ্র নারী জাতির তাঁদের জন্য গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিক্ষার ফলে তাঁদের চরিত্র দিন দিন উন্নত হয়েছিল। অথচ এই সমস্ত দেশে তার অর্ধ শতক আগেও মেয়েরা কেবলমাত্র লিখতে এবং পড়তে শিখেছিলেন। তারপরেও অনেক যুক্তিতর্কের পরেমেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। সে সময়ের মাত্র ৩৭ বছরআগে মেয়েরা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণেরঅনুমতি পেয়েছিলেন। অথচ তাঁরা এর মধ্যেই স্কুলবোর্ডের সভ্যপদ, কলকারখানার পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্যের ইনস্পেক্টর, ডাক বিভাগের উচ্চ কর্মচারী, শিল্প, সাহিত্য, সংবাদপত্র পরিচালনা, বিজ্ঞান-চর্চা প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের সকল কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।তাই প্রবন্ধকার ভারতবর্ষের মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

> "আমাদিগকে নিরাশ বা ভীত হইলে চলিবে না। যে কোন মহৎ কার্য্যে যাহাদিগকে অগ্রণী হইতে হয়, তাঁহাদিগকে অনন্যসাধারণ সাহসিকতা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতে হয়। শিক্ষিতা নারীগণ যেন উচ্চ শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম উদ্রেক করিতে সক্ষম হন।"[১২]

কারণ মানুষ অনুকরণকারী জীব। একজন শিক্ষিত নারীকে দেখে সমাজে পিছিয়ে থাকা নারীরা এগিয়ে আসার অনুপ্রেরণাপাবে।

'ভারত-মহিলা' পত্রিকায় ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজকুমারী দাসের লেখা 'অবরোধ-প্রথা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি লিখেছিলেন—

> "আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই নারীর অবরোধ-প্রথা প্রচলিত আছে। মুসলমানদিগের শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই যে এই প্রথার সূত্রপাত হয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সুতরাং যেখানে মুসলমানের প্রাদুর্ভাব হয় নাই, সেখানে অদ্যাপি স্ত্রীলোকেরা উন্মুক্ত ভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন। মহারাষ্ট্রীয় ও পার্শী রমণীগণ ইহার দৃষ্টান্ত।"[১৩]

অর্থাৎ প্রাবন্ধিক মনে করতেন, এই দেশে অবরোধ প্রথা শুরু হয়েছিল মুসলমানদের শাসনের জন্য। কারণ তাঁর মতে, ঋগ্বেদে অবরোধপ্রথার উল্লেখ নেই। তখন নারী স্বাধীন ছিলেন ও বিদ্যাচর্চা করতেন। সমস্ত সংসারের ভার তাঁর উপর থাকত। অবিবাহিত দেবর ও ননদগণ তাঁর অধীনে ছিলেন। তিনি সকলকে শাসন করতে পারতেন। তখন স্ত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ করতে এতো বাধা অতিক্রম করতে হত না।[১৪]কারণ বিশ্ববারা নামে একজন মহিলা সেকালে বৈদিক গীত রচনা করতে পেরেছিলেন। এই প্রচলিত অবরোধ-প্রথাকেপ্রাবন্ধিক ভারতবাসীর জন্য অভিশাপের চোখে দেখেছিলেন। কারণ এই প্রথার জন্যেই এই দেশেরমেয়েদের স্বাধীনতা এবং বিদ্যাচর্চা ক্রমে হ্রাস পেয়েছিল। সেকালে বিদ্যার অভাবে মহিলারা সহধর্মিণী হলেও প্রকৃত পক্ষে জীবনের সঙ্গিনী হতে পারতেন না। তাঁরা গুরুতর বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে অক্ষম ছিলেন। গার্হস্থ্য জীবনের নিম্নতম স্তর ভিন্ন আর কিছুই তাঁদের অধিকারে ছিল না। ফলে তাঁরা সন্তানের শিক্ষা ও শাসনের ভার গ্রহণ করতেও সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন। কারণ, যে মা নিজেই শিক্ষা লাভ করেননি, তিনি কি প্রকারে সন্তানকে সুশাসন করবেন? তিনি নিজের সেবার ভার নিতে সক্ষম থাকলেও, মায়ের যে গুরুকর্তব্য অর্থাৎ সন্তান-শাসনে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ছিলেন। পরের ইচ্ছা দমন করে তা নিজের ইচ্ছায় পরিণত করার নাম শাসন। শাসন করতে গেলে সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছা বজায় থাকে না, সেটাও কিছুটা পরিমাণে দমন করতে হয়, নতুবা শাসন অত্যাচারে পরিণত হয়। কি পরিমাণে শাসিতের ইচ্ছা দমন করতে হবে ও কি পরিমাণে তা অনুমোদন করতে হবে, তা অশিক্ষিতের বিচার কবার ক্ষমতা নেই।[১৫] তাই প্রাবন্ধিক রাজকুমারী দাসের চোখে,আমাদের দেশের মেয়েরা সন্তান শাসন বা মানুষ করার জন্য পারদর্শী ছিল না।

প্রাবন্ধিক শ্রীমতী রমণ পিলাই-এর ইংরেজি বক্তৃতার মর্ম্ম প্রকাশিত হয়েছিল 'সমাজে নারীর স্থান' নামে। এই প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি মহিলাদের নিয়ে বলেছিলেন—

> "The hand that rocks the cradle rules the world— যে হাতখানি শিশুর দোলনায় দোল দেয় তাহাই সাম্রাজ্য শাসন করে,— ইংরেজী ভাষায় একটি সর্ব্বজনবিদিত প্রবাদ বাক্য। ...অন্য কথায় ইহার অর্থ— কোন জাতির নারীরা যেমন জাতিটীও তেমন। কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি প্রধানতঃ তাহার অন্তর্গত নারীদিগের দ্বারাই গঠিত হয়। অন্যান্য প্রভাব নারীর প্রভাবের নিম্নে। শৈশবাবস্থায় মানুষের উপর যে প্রভাব প্রধান ভাবে কাজ করে তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী প্রভাব আর কিছু নাই বলিলেই চলে। জননীর প্রভাবের অপেক্ষা মানবজীবনে আর কোন প্রভাবই শ্রেষ্ঠ নহে।"[১৬]

তাই প্রাবন্ধিক মনে করতেন, কোন দেশের নারী যদি শুধু বাড়ির কাজের মধ্যেই নিজের শক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখেন, তাহলে অর্ধাংশ উন্নতির শীর্ষে পৌঁছালেও বাকি অংশ পিছিয়ে থাকবে। তাই সেই দেশের সার্বজনীন উন্নতি অসম্ভব। বিশ শতকের মহিলাদের থেকে বৈদিক যুগের নারীরা শুধু ব্যক্তিগত ভাবেই স্বাধীন চিন্তক ছিলেন না, সামাজিক দিক থেকেও তাঁরা স্বাধীন ছিলেন। পুরুষের সঙ্গে মিলিত ভাবেযাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং একসঙ্গে ধর্ম সাধন করতেন। অনেক শিক্ষিত নারী বেদ মন্ত্র রচনাও করেছিলেন। তখনকার দিনে নারীর স্বাধীনতার উপর কোনরকম হস্তক্ষেপ করা হত না। সমাজে তাদের যে ন্যায্য স্থান ছিল, তা থেকে তাদের দূরে রাখতে কেউ চেষ্টা করত না। প্রাচীন গ্রন্থে নারীর অবগুণ্ঠনের উল্লেখ থাকলেও অবরোধের কোন উল্লেখ

নেই। তাঁরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতেন। বড়ো বড়ো রাজকীয় সভায় উপস্থিত থাকতেন। প্রকাশ্য ভাবে যেখানে সেখানে যাতায়াত করতেন। তখনকার দিনে মহিলারা নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এমনকি রাজনৈতিক আলোচনায় এবং শাসন কার্যেও তাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই প্রাবন্ধিক মনে করেন, পুনরায় নারীদের উন্নতি করার প্রধান উপায় হল শিক্ষা। অন্তরে জ্ঞানের আলো না জ্বললে সমাজে তাঁদের অধিক অধিকার দেওয়া বৃথা। নিজের কর্তব্যের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগতের জ্ঞান না জন্মালে স্বাধীনতা লাভ ও স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার জন্মাবে না। আর স্বাধীন ভাবে না বাঁচতে পারলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। যে সমাজে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সুন্দর বিকাশ হয়েছে, সেই সমাজ উন্নত না হয়ে পারেনি। ইউরোপ ও আমেরিকার লোক যে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছাতে পেরেছে, তার একটা প্রধান কারণ তাদের মহিলারা সমান ভাবে শিক্ষা লাভ করেছে। এরপরেও তাদের সভ্যতা ও সমাজে যে সমস্ত দোষ আছে, তার প্রধান কারণ শিক্ষা প্রণালীর দোষ। এশিয়ার মধ্যে জাপানের দৃষ্টান্ত আদর্শ জনক।জাপানের উন্নতির এক প্রধান কারণ স্ত্রী-পুরুষ সকলকে শিক্ষা লাভের উপযুক্ত বয়স থেকে স্কুলে যেতে হয়। সাধারণ শিক্ষার পর প্রত্যেক বালক-বালিকাকেই নিজ নিজ বিশেষত্ব অনুসারে জীবন সংগ্রামের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়। স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে আমরা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার থেকে নারীদের মুক্তি লাভকে বুঝে থাকি। কিন্তু জাপানের কাছে তা নয়।[১৭]বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা নিলেই নারীদের উন্নতি বা পূর্ণ বিকাশ হবে— প্রাবন্ধিক রমণ পিলাই তা বলেননি। আবার তাঁর এই অভিপ্রায় ছিল না যে— বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত নারীগণই দেশের সর্বাপ্রেক্ষা উন্নত নারী সম্প্রদায়। তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল— আমাদের দেশে, যেমন পুরুষদের মধ্যে তেমনি স্ত্রীদের মধ্যেও অনেকে আছেন, যাঁরা উচ্চ জ্ঞানচর্চায় এবং উদার, উন্নত, চরিত্র-গুণে সমাজের অলংকার-স্বরূপ।এছাড়াও তিনি দৃঢ় ভাবেই বিশ্বাস করতেন, নারীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হলে দেশ পরম লাভবান হবেন।[১৮]তাই তিনি চেয়েছিলেন সকলের বিকাশ।

বিশ শতকে অবরোধ প্রথা নিয়ে বহু লেখালেখি হলেও, কার্যকরী ভাবে মেয়েদের উন্নতি তখনই সম্ভব হয়েছিল, যখন মেয়েরা নিজে থেকে সচেতন হয়ে উঠেছিল। কারণ একজন মানুষ যতক্ষণ না নিজের জন্য লড়াই করতে শেখে, তার পাশে কেউ দাঁড়ায় না। আর যে নিজের জন্য লড়াই করতে পারে, সে দুনিয়ার সকলের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। কারণ আত্মবল হল সবথেকে বড়ো বল। তবে এটাও ঠিক, সেদিনের মহিলারা অল্প করে হলেও, এগিয়ে আসার জন্যেই আজকের মেয়েরা এতো উন্নত হয়েছে। কারণ প্রথম পদক্ষেপ ক্ষুদ্র হলেও তার একটা মূল্য আছে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, স্বপন সম্পাদনা। উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৪৩।
২. তদেব, পৃ. ৬৭।
৩. দাসী, রাসসুন্দরী। আমার জীবন। দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৩৮।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা। কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা-সংগ্রহ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৬৬-৬৭।
৫. তদেব, পৃ. ৮৩।
৬. চট্টোপাধ্যায়, অরুণা সম্পাদনা। কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ। সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬০, কলকাতা, পৃ. ৯২।
৭. কাদির, আবদুল সম্পাদনা। রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ১৯৭১, ঢাকা, পৃ. ৩৭৫।

৮. মুরশিদ, গোলাম। নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, নয়া উদ্যোগ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৪৯।
৯. রায়, ভারতী সংকলন ও সম্পাদনা। নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০–১৩২৯ বঙ্গাব্দ), পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ. ১৮৪।
১০. দত্ত, সরযূবালা সম্পাদনা। ভারত-মহিলা, প্রথম ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩১২, পৃ. ৬৩।
১১. তদেব, তৃতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১৪, পৃ. ৬।
১২. তদেব, তৃতীয় ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১৪, পৃ. ৫২।
১৩. তদেব, তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪, পৃ. ২৫।
১৪. তদেব, পৃ. ২৭।
১৫. তদেব, পৃ. ২৫।
১৬. তদেব, দ্বাদশ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৩, পৃ. ৯৩।
১৭. তদেব, পৃ. ৯৪।
১৮. তদেব, পৃ. ১০২।